একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Journey to Modernity: Women Education in Pre-Independence Era in India

আধুনিকতার অভিযাত্রা: ভারতবর্ষে প্রাক-স্বাধীনতা কাল ও নারী শিক্ষা

Name of the Author: **Sweta Chatterjee**

Affiliation: **State Aided College Teacher, Environmental Studies, Umeshchanda College, Kolkata, West Bengal, India**

ORCID ID: 0009-0001-1085-4013

Abstract: Women education in India during pre-independence era was a social revolution in India. India's glorious past in women education during Vedic period faced a number of barriers during medieval period such as religious orthodoxy, child marriage and other social restrictions. The great thinkers of Bengal like Raja Rammohun Roy, Iswar Chandra Vidyasagar etc. took the initiative to educate the women of the society and a number of female schools were established. They received tremendous support from the Western thinkers like John Drinkwater Bethune, Reverend May, William Carey etc. Woods' Despatch in 1854 and Hunter Commission's Report in 1882 advocated for the spread of women education in India. Renaissance in Bengal was a mark of advancement in the then Indian society and it enhanced the women education not only in Bengal but in the several corners of the nation. Jyotirao Phule and Savitribai Phule were the pioneers of women education in Pune. Princely states in India also took the great initiative to establish female schools in their respective states and territories like Nizam of Hyderabad and King of Baroda. Gradually during pre-independence era women education in India proliferated from school education to higher education including technical and medical education sectors.

Key Words: Pre-Independence, Medievalism, Women Education, Orthodoxy, Missionaries, Girls' School, Nationalism, University, Self-Dignity, Woods' Despatch.

আধুনিকতার অভিযাত্রা: ভারতবর্ষে প্রাক-স্বাধীনতা কাল ও নারী শিক্ষা

শ্বেতা চ্যাটার্জী

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ একটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই এবং সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগে নারীশিক্ষার যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ছিল, মধ্যযুগের সামাজিক জড়তা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ এবং রক্ষণশীলতার আবর্তে তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। নারীসমাজ কেবলমাত্র যেন গৃহকোণের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এক নবজাগরণের বার্তা আসে, যার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল নারীশিক্ষা। আসলে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ নারীজীবনের রুদ্ধদুয়ার উন্মোচনে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পড়তে শুরু করে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোম্পানি সরকার নারীশিক্ষার বিষয়ে উদাসীন ছিল। এই পরিস্থিতিতে আলোকিত কিছু ভারতীয় মনীষী, যেমন রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আধুনিক চিন্তাধারায় এবং বিদেশি মিশনারিদের অদম্য সংকল্পে নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাজা রামমোহন রায় নারীশিক্ষার জন্য জনমত তৈরি করতে অগ্রসর হন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীর মুক্তি এবং সমাজের উন্নতি শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। তবে নারীশিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি একদিকে যেমন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে নারীশিক্ষার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করেন তেমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলার নানা অঞ্চলে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। নিজের অর্থে স্কুল পরিচালনা করা থেকে শুরু করে ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের উৎসাহিত করার কাজ করেন যাতে তারা তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠান। আসলে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান হল চিরস্মরণীয়। বিশেষত, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা এবং বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৪৯ সালে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' (যা বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষার এই জোয়ার কেবলমাত্র বাংলাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। পুনেতে ফুলে দম্পতি নিম্নবর্গের নারীদের শিক্ষিত করার জন্য যে সংগ্রাম শুরু করেন, তা সমাজ সংস্কারে নতুন মাত্রা যোগ করে। সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় উপেক্ষা করে তারা নীচুতলার নারীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে ইতিহাস গড়েন, যা তখনকার সমাজে ছিল অকল্পনীয়। দক্ষিণ ভারতেও বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। এই সময়ই কেশবচন্দ্র সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ নারীশিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলনেও পরিণত করে। ব্রহ্মিকা বিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা নারীদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের আরও সক্রিয়তা এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় নারীর আত্মনির্ভরশীলতার পথ প্রশস্ত হয়। পরে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীশিক্ষা আর কেবল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ থাকল না, এটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে

মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী ভাবধারা নারীদের অন্দরমহল থেকে রাজপথে নিয়ে আসে, যেখানে শিক্ষা হয়ে ওঠে অধিকার আদায়ের হাতিয়ার। মহাত্মা গান্ধী নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “If you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate an entire family.”[১] অর্থাৎ একজন পুরুষ শিক্ষিত হওয়া মানে একজন ব্যক্তির শিক্ষিত হওয়া, কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত হওয়া মানে গোটা পরিবারের শিক্ষিত হওয়া। এছাড়া, এই সময়েই শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত এবং সরোজিনী নাইডুর মতো মহিয়সী নারীদের উত্থান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। ১৯১৬ সালে ধন্ডো কেশব কার্ভে জাপানের আদলে পুনেতে প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (SNDT University) প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতীয় নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। অন্যদিকে, বেগম রোকেয়ার মতো মহীয়সী নারীর অবদানে মুসলিম সমাজেও শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। পর্দানশিন মুসলিম নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কলকাতায় ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়’ স্থাপন করে তিনি এক কঠিন সামাজিক লড়াই জয় করেন। তাঁর লেখালেখির মাধ্যমেও তিনি নারীদের আত্মমর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করেন। একই সময়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং বড়োদার গাইকোয়াড় রাজবংশও নিজেদের রাজ্যে নারীশিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য অনুদান ও সহযোগিতা দেন। তবে, নারীশিক্ষার এই পথ চলা কিন্তু মসৃণ ছিল না। রক্ষণশীল সমাজের বাধা, দরিদ্রতা এবং উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের অভাব বড় অন্তরায় ছিল। মিশনারিদের উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলগুলোতে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয় থাকায় অনেক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। এই সমস্যা সমাধানে বিদ্যাসাগর বা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে নারীশিক্ষার প্রসারে জোর দেন। বিবেকানন্দ মনে করতেন, নারীদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধান করতে পারে। তিনি বলেন, “নারীদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়িয়ে দাও, তখন তাহারাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবেন।”[২] এই ভাবধারা ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ধীর গতিতে নারীরা চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রমুখী বসুর মতো নারীরা গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে প্রমাণ করেন যে মেধায় তারা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। ডক্টর আনন্দীবাই জোশী এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে নারীশিক্ষার চূড়ান্ত সফলতার দ্বার উন্মোচন করেন। অতএব বলা যায়, ধন্ডো কেশব কার্ভের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসুর স্নাতক ডিগ্রি লাভ—প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল যেন সমগ্র নারীজগতের কাছে এক একটি জয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের নীতিতেও ক্রমে পরিবর্তন আসে। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ এবং ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের সরকারি স্বীকৃতি নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে পূর্ণতা দেয়। দীর্ঘ লড়াই ও সামাজিক বিবর্তনের এই পথ ধরে বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে নারীরা কেবল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষায় নয় বরং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থান জোরালোভাবে তৈরি করতে শুরু করেন। যার ফলেই স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় নারীরা তাঁদের মেধা ও মননের স্বাক্ষর রেখে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শক্তিশালী

অবস্থানে পৌঁছান, যা পরে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার ভিত্তি গড়ে দেয়। সুতরাং বলা যায়, প্রাক-স্বাধীনতা যুগের নারীশিক্ষার ইতিহাস হলো একটি দীর্ঘ লড়াইয়ের আখ্যান, যেখানে কুসংস্কার এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে জয় হয়েছে আধুনিকতা এবং যুক্তিবাদিতার। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বেগম রোকেয়া কিংবা সাবিত্রীবাই ফুলের মতো মানুষদের ব্যক্তিগত বলিদান এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা আজ ভারতের নারী সমাজকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁদের রোপণ করা সেই শিক্ষার বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে, যা আধুনিক ভারতের প্রতিটি স্তরে নারীদের সাফল্য নিশ্চিত করে চলেছে। শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং নারীর আত্মপরিচয় এবং আত্মনির্ভরতার চাবিকাঠি--এই ধ্রুব সত্যটি প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মনীষীরা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন বলেই আজ ভারতবর্ষের নারীরা বিশ্বমঞ্চে স্বমহিমায় ভাস্বর। আর সেই কারণেই বর্তমান “আধুনিকতার অভিযাত্রা: ভারতবর্ষে প্রাক-স্বাধীনতা কাল ও নারী শিক্ষা” নামক গবেষণাপত্রটি লেখার চেষ্টা করা হল।

উদ্দেশ্য: বর্তমান গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য হল “আধুনিকতার অভিযাত্রা: ভারতবর্ষে প্রাক-স্বাধীনতা কাল ও নারী শিক্ষা” সম্পর্কে পাঠক সমাজকে অবগত করা এবং তা বিশ্লেষণ করা।

প্রাক-স্বাধীনতা কালের ধারণা: সাধারণভাবে, প্রাক-স্বাধীনতা কাল (Pre-Independence Era) বলতে ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসন আমলের সেই সময়টিকে বোঝায়, যা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ, ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু (পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭) থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে ১৯০ বছরের সময়কালকেই প্রাক-স্বাধীনতা কাল বলা হয়।

গবেষণার পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে প্রাক-স্বাধীনতা কালে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থান, শিক্ষাব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক প্রকৃতির। তাই, বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির (Historical Method) সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক (Analytical Approach) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক উৎস (Secondary sources) হিসেবে বিভিন্ন বই এবং গবেষণাপত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে।

প্রাক-স্বাধীনতা কালে নারী শিক্ষা:

উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারী শিক্ষার বিস্তার এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। ইংরেজ শাসনের শুরুর দিকে মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। আঠারো শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের শুরুর দিকে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে রাজা, জমিদার বা অভিজাত পরিবারের কন্যারা প্রধানত অন্তঃপুরেই ঘরোয়াভাবে যৎসামান্য অক্ষরজ্ঞান লাভ করতেন। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তবে এই বন্ধ্যাদশা ভাঙার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য খ্রিস্টান মিশনারিদের। তাঁরাই প্রথম সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রকে উন্নীত করতে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত “হেজেস গার্লস স্কুল“ ছিল তারই এক উদাহরণ।

বিশদ বিবরণ না পাওয়া গেলেও সম্ভবত এটাই ছিল তৎকালীন সময়ে প্রথম মেয়েদের স্কুল। তবে পরবর্তীতে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার এক্ট (Charter Act) আসার ফলে মিশনারিদের কাজের প্রকৃতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। এবং তখন তাঁরা সরকারের সাহায্য পাওয়ার ফলে শিক্ষাকে আরো অন্যান্য দিকে সম্প্রসারিত করতে লাগলেন। নারীশিক্ষার প্রসার তার মধ্যে অন্যতম। মূলত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও, মিশনারিরাই এদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নারীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর মিশন মেয়েদের শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং ছেলেদের বিদ্যালয়ে প্রথম একটি মেয়েকে ভর্তি করে ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এর পরবর্তীতে লন্ডন সোসাইটির রেভারেন্ড মে ১৮১৮ সালে চুঁচুড়াতে মেয়েদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার পথ দেখানো শুরু করেছিলেন। এছাড়া ১৮১৯ সালে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এদের দৃষ্টান্ত দেখেই কলকাতায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনটি মহিলা সংগঠন [ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮১৯), লেডিস অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৫) এবং লেডিস সোসাইটি (১৮২১)] নারী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসে এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করে। ১৮২০ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (যার পরবর্তীতে নাম হয় ক্যালকাটা ব্যাফটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি) মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে আঠারোটি স্কুল স্থাপন করে। সুতরাং বলা যায় যে,ব্যাফটিস্ট মিশনারি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিস অ্যাসোসিয়েশন এবং লেডিস সোসাইটির মতো সংগঠনগুলো তৎকালীন সময়ে এদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি চুঁচুড়া ও বহরমপুরে এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি বাংলার বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া এবং উওর ভারতের নানান স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। শ্রীরামপুর মিশনও বাংলায় শ্রীরামপুর ও তার চারপাশের গ্রামে ৩১ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। তবে শ্রীরামপুর মিশনের নারী শিক্ষার প্রসারে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় শুধু বাঙলাতেই নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে (যেমন এলাহাবাদ, বেনারস ও ব্রহ্মদেশে)। মিশনারিদের পরিচালনায় ১৮২১ সালে মাদ্রাজে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। তবে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সাতটি-তে। এছাড়া ১৮২৪ সালে বম্বেতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এই মিশনারিদের পরিচালনায়। যার সংখ্যাও দশ বছর পরে বেড়ে দাঁড়ায় ১০টি স্কুলে। ১৮৩৫ সাল নাগাত সেই সময়ের অবিভক্ত বাংলাদেশে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি স্থানে মিশনারিদের উদ্যোগেই মেয়েদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তবে নারী শিক্ষার ব্যাপারে মিশনারিদের এই প্রয়াসের সাথে সাথেই শ্রীরামপুর মিস ফোন, মিসেস উইলসন, মিসেস পায়াস এবং ড্রিংকওয়াটার বেথুনের মতো হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের অবদান এ প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮২৬ সালে মিস কুক (যিনি বিবাহ সূত্রে পরবর্তীকালে মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হয়েছেন) রাজা বৈদ্যনাথের দেওয়া কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে “সেন্ট্রাল স্কুল” স্থাপন করেন যেখানে মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণও আরম্ভ হয়। এছাড়া স্কটিশ মিশনের রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ- ও মেয়েদের জন্য ”সেন্ট মার্গারেট স্কুল”, “ডাফ স্কুল”, “ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল”, “হোলি চাইল্ড স্কুল“ প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে নারী শিক্ষার বিকাশে উক্ত এই সব প্রচেষ্টার পরেই আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর ডঙ্কা (যা বাংলায় ইতিহাসে নবজাগরণের যুগ নামেও পরিচিতি) যা মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশীয় শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা আন্দোলনে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়। ভারতীয় শিক্ষাব্রতী রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালংকার এবং পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীরা নারী শিক্ষার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে অন্ধকারে রেখে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। তাই রাধাকান্ত দেব কলকাতার শোভাবাজারে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তবে উনিশ শতকে বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে যার নাম বিশ্ববরেণ্য তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতির ধারক ও বাহক ছিলেন বিদ্যাসাগর।। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে নিজ প্রচেস্টায় এবং তৎকালীন সরকার ও সমাজের আংশিক সহযোগিতায় তিনি নারীশিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। মানবতাবাদের প্রেরণায় তিনি সমাজের দুটি অঙ্গ-পুরুষ ও নারী, উভয়ের শিক্ষার ও স্বাধীনতার জন্য সমান উদ্যোগী ছিলেন। এজন্য তিনি আজীবন নিরলস সংগ্রামেও লিপ্ত ছিলেন। সেসময় সাধারণ পরিবারের মেয়েরা, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অজ্ঞানতার অন্ধকারেই দিনযাপন করত। তাদের জীবন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্যের অভিশাপে জর্জরিত ছিল। সেই অভিশাপ মোচনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। এজন্য তিনি যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তা ভারতীয় নারীমুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। নারী শিক্ষার বিষয়ে তাঁর উদ্যোগ ছিল ব্যাপক, যার বহুবিধ নিদর্শনও মেলে। তিনি বলেন–"স্ত্রী জাতি শিক্ষিতা ও জ্ঞানসম্পন্না হলে তারা শিশুদেরকে সুশিক্ষা দিতে পারবে"।[৩] তাই এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই তিনি বেথুন সাহেবের ও দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কলকাতায় ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'(Calcutta Female School), যা ছিল নারী শিক্ষার ইতিহাসে এক মাইলফলক। বিদ্যাসাগরের নির্দেশে এই স্কুলের ছাত্রীদের জন্য ফটকের সামনে লেখা থাকত–"পুত্রের মতো কন্যাকেও সযত্নে পালন করতে হবে ও শিক্ষা দিতে হবে।"[৪] ১৮৮৭ সালে এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। বেথুন স্কুল ছাড়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় (যেমন: মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ইত্যাদি) প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিলো। এই স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় 3500 জন। একই সাথে তিনি নারী শিক্ষার জন্য গঠন করেছিলেন 'নারীশিক্ষা ভান্ডার'। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই নিরলস প্রচেষ্টা তৎকালীন সময়ে বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অন্য মাত্রাই যুক্ত করেছিল। তবে শুধু বাংলাতেই নয়, সেই সময় নবজাগরণের ঢেউ উঠেছিলো ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও। বাংলার বাইরেও এর নিদর্শন মেলে। যেমন: পুনেতে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিলো নারী শিক্ষাকেন্দ্র। তেমনি রামাবাঈ সরস্বতীর প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রে মহিলাদের শিক্ষা দান ও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করতে

গড়ে উঠেছিলো “সারদা সদন“ নামক হোম বা আবাসন এবং “Industrial Training School”। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে, উনিশ শতকে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে মিশনারি ও দেশীয় শিক্ষাব্রতীদের অবদান ছিল অনবদ্য। তবে একইসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ, নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী এবং আর্য সমাজের মতো সংগঠনগুলোর কথাও উল্লেখ করতেই হয়। কারণ এইসব সংগঠনগুলো নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত গঠন করে সামাজিক জড়তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। তবে এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না। কারণ ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘকালযাবৎ ‘ধর্মীয় নিরপেক্ষতার’ অজুহাতে নারী শিক্ষার প্রসারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। তবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন গতি ধারা এনেছিল। ১৮১৩-র এই অ্যাক্টে বলা হলো যে, শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দিতে কোম্পানি এক লক্ষ টাকা প্রতি বছর অনুদান দেবে। এর ফলশ্রুতিতেই প্রচুর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে বেশ কিছু মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। তবে চার্টার অ্যাক্ট এর পরবর্তীতে মেকলের মিনিট (১৮৩৫) এবং রাজা রামমোহন রায় ও উইলিয়াম বেন্টিংক ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক পরিবর্তনের যে সূচনা করেছিলেন তার হাত ধরেই নারী শিক্ষা প্রসারের পথ এদেশে আরো বেশি করে সুগম হয়েছিলো সেকথা বলাই যায়। ১৮৫০ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বলেছিলেন যে, একমাত্র নারী শিক্ষার মাধ্যমেই এদেশের মানুষের মধ্যে কার্যকরী পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাই তিনি সরকারকে এব্যাপারে উদ্যোগ নেবার ও উৎসাহ দেবারও কথা বলেন। এরই প্রতিফলন দেখা যায়, ১৮৫৪ সালের Wood’s Despetch – এ। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ বা উডের নির্দেশনামা প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারি পূর্বোক্ত সকল নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটে। এবং এই প্রথম সরকারি দলিল, যাতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক অনুদান বা ‘গ্রান্ট-ইন-এইড’ দেওয়ার প্রথা চালু হয়। যার ফলে ১৮৭০-১৮৮২ সালের মধ্যে বেশ কিছু নারী শিক্ষা কেন্দ্র (প্রায় ২৬০০ টির মত প্রাথমিক বিদ্যালয়,৮১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৫টি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া, ইংরেজ সমাজ সংস্কারক মিস মেরি কারপেন্টারের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রও এই সময়েই প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া একই সময়ে ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয় এবং প্রথম ভারতীয় দুই মহিয়সী মহিলা চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন যা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে। আসলে শিক্ষার এই ক্রমবিকাশের ধারায় আঠারোশ সত্তর ও আশির দশক ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে শুধু এইটুকুই নয়,উডের নির্দেশনামার পরবর্তীতে নারী শিক্ষার প্রসারে ইংরেজ সরকার আরও বেশি করে উৎসাহ দেখান। তারই ফলে ১৮৮২-১৮৮৩ সালের হান্টার কমিশন নারী শিক্ষার জন্য আরও উদার নীতি গ্রহণের সুপারিশ করে। এই কমিশনের পরামর্শেই নারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ‘নর্মাল স্কুল’ এবং নারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মেয়েদের বিদ্যালয় খোলার জন্য সরকারি তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা, অনুদান দেওয়া, অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করা, বৃত্তির ব্যবস্থা করা ইত্যাদিও এই হান্টার কমিশনের সুপারিশ ছিল। তবে

কমিশনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে পারেনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই নারী শিক্ষা বেসরকারী উদ্যোগের উপরেই নির্ভরশীল হয়েছিল। আর এই বেসরকারী উদ্যোগেই ১৯০১-১৯০২ সালের মধ্যে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২টি মহিলা মহাবিদ্যালয়, ৪২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫৩০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এর সাথেই এই সময়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল মহিলাদের জন্য ডাক্তারি পড়বার সুযোগ খুলে যাওয়া। আর তার জন্যই গড়ে উঠেছিল একটি তহবিল, যার নাম ছিল "লেডি ডাফরিন ফান্ড"। এর পরবর্তীতে ১৯০২ সালে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশনের সময় থেকে ১৯২১ সালে যখন শিক্ষাকে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরকরণের উদ্যোগ নেওয়া হলো সেই সময়কাল অবধি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি ও সামাজিক সচেতনতার কারণে নারী শিক্ষার বেশ দ্রুত অগ্রগতি দেখা যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়কালটি ভারতের নারীশিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাক্ষী। বিংশ শতকের এই প্রথম দুই দশকে সামাজিক রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার এক নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯০২ সালে যেখানে বিদ্যালয় যাওয়ার যোগ্য মেয়েদের মাত্র ২.৫ শতাংশ শিক্ষার সুযোগ পেত, ১৯১২ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে ৫ শতাংশে পৌঁছায়। যদিও তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং কঠোর সামাজিক বিধিনিষেধ নারীশিক্ষার পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবুও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে এই স্থবিরতা কাটতে শুরু করে। ১৯১৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (D.P.I.) সম্মেলনে সামাজিক সংবেদনশীলতা বজায় রেখেই নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এর জন্য পৃথক বোর্ড গঠন ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ধীর গতির তুলনায় এই সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিমাণগত উল্লম্ফন লক্ষ করা যায়। ১৯০১-০২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা যেখানে ছিল যথাক্রমে ৩২ হাজার ও ৭ হাজার, ১৯২১-২২ সালে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯২ হাজার এবং ৩৬ হাজার। এই অগ্রগতির মূলে ছিল বাল্যবিবাহের হার হ্রাস, বিবাহিত মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষিত পাত্রীর সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি। তবে শিক্ষার এই প্রসার মূলত শহর ও শহরতলি কেন্দ্রিক ছিল। পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণের ফলে গণিত ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি গার্হস্থ্যবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, সূচিশিল্প ও সংগীতের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নারীদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে এবং নতুন নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করে। উচ্চশিক্ষার আঙিনাতেও এই পরিবর্তন ছিল সমভাবে দীপ্যমান। ১৮৮২ সালে মহাবিদ্যালয়ে পাঠরতা ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন, যা ১৯০১-০২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ জনে। ১৯২১-২২ সালের মধ্যে মহিলা কলেজের সংখ্যা ১২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯টিতে উন্নীত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনও নারী শিক্ষার শোচনীয় হারের প্রেক্ষিতে স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন এবং স্ত্রী শিক্ষার জন্য বেশি সরকারি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি মেয়েদের জন্য অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অধিক সংখ্যক স্কুল পরিদর্শিকা নিয়োগ করেন। এছাড়া শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ

গুরুত্ব দেন। এভাবেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগেই সেই সময়ে মেয়েদের জন্য বহু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়। তবে এই সব ব্যতিরেকে ১৯০৫-১৯২০ সালের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবিন্দরা নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জাতীয় চেতনায় শিক্ষিত মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। যার ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। তারই ফলে ১৯০৪ সালে শ্রীমতি অ্যানি বেসান্তের চেষ্টায় বারাণসীতে "সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সালে ব্যাঙ্গালোরে শ্রীমতি পার্বতী আম্মা চন্দ্রশেখর "মহিলা সেবা সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ১৯২০ সালে এই "মহিলা সেবা সমাজ" একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্রও খোলে। এছাড়া এই সময়কার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি। এর ফলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগের বৃদ্ধি ঘটে। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ এবং শিক্ষা চালিয়ে গিয়ে সেটি সমাপন করার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের ভিতরও একটা সামাজিক এবং মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বাড়ায় নারী শিক্ষারও প্রসার হতে দেখা যায়। এছাড়া এই সময়েই নারী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯১৬ সালে মহর্ষি ডি. কে. কার্ভের হাত ধরে। তিনি ১৯১৬ সালে বম্বেতে এস. এন. ডি. টি. নারী বিশ্ববিদ্যালয় (S. N. D. T. Woman's University) প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে ১৯১৬ সালে মেয়েদের শিক্ষার জন্য "লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজও "প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১-২২ সময় নাগাদ দেখা যায় যে ১৯৭ জন মহিলা ডাক্তারি কলেজে এবং ৩৩৪ জন ডাক্তারি বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করেছেন। ৬৭ জন শিক্ষক শিক্ষণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মহাবিদ্যালয়ে এবং ৩৯০৩ জন নিয়েছেন বিদ্যালয়ে। বহু সংখ্যক মহিলা বাণিজ্যিক বিদ্যা (Commerce) এবং প্রযুক্তি (Technical Course) নিয়ে চর্চা করেছেন। ১৯১৭ সালে "উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন" (Women's Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীদের উপযোগী বিশেষ পাঠক্রম ও 'সুমাতা ও সুগৃহিণী' গড়ে তোলার আদর্শ নিয়ে শুরু হওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়টি নারীশিক্ষাকে এক নতুন দার্শনিক ভিত্তি দান করে। সবশেষে, এই যুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য ছিল বৃত্তিশিক্ষার প্রসার। দীর্ঘকাল ধরে নারীদের কর্মক্ষেত্র কেবল শিক্ষকতা ও চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, এই সময়ে চারুকলা, আইন, বাণিজ্য, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার দুয়ার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯১৬ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক দিল্লিতে বিশেষ মহিলা মেডিকেল কলেজ স্থাপন চিকিৎসাবিদ্যায় নারীদের অংশগ্রহণকে আরও সুসংহত করে। যদিও এই বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ শুরুতে মূলত উচ্চবিত্ত হিন্দু ও খ্রিস্টান নারীদের মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও ১৯২১ সাল নাগাদ তা বৃহত্তর কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। মূলত এই দুই দশকের নিরলস প্রচেষ্টাই আধুনিক ভারতের স্বাবলম্বী নারী সমাজ গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। এর পরবর্তীতে ১৯২১-১৯৪৭ এর মধ্যে নারী শিক্ষার আরও বেশি অগ্রগতি দেখা গেল। আসলে ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের নারী শিক্ষার বিবর্তন ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর এই তিন দশকে ভারতীয় নারীদের মধ্যে কেবল শিক্ষার আলোই পৌঁছায়নি, বরং তাদের সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নারীদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণ

এবং আইনসভায় আসন সংরক্ষণের মতো ঘটনাপ্রবাহ তাদের জনজীবনে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। এই সময়েই ‘অল ইন্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স’-এর মতো সংগঠনের জন্ম হয় এবং ১৯২৭ সালে পুনায় অনুষ্ঠিত প্রথম শিক্ষা সংস্কার সম্মেলনে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে সাক্ষরতার হার মাত্র ৩ শতাংশের কাছাকাছি থাকলেও, আলোকপ্রাপ্ত নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে অন্দরমহলের নারীরা দেশমুক্তির লড়াইয়ে শামিল হন, যা পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধ বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বেনারস ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র মহিলা বিভাগ এবং বিদ্যাসাগর কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে এই অগ্রগতির পথে বড় বাধা ছিল গ্রামীণ অবহেলিত জনপদ ও উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব, যা হার্টগ কমিটির প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উঠে আসে। হার্টগ কমিটি নারী শিক্ষাকে একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং মাতা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের স্বার্থে মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করে। তাদের পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমে জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, নারী পরিদর্শিকা নিয়োগ এবং শিক্ষা বিভাগে স্বতন্ত্র ডেপুটি ডিরেক্টর পদের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব পায়। যদিও ব্রিটিশ সরকার অনেক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নীতি নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তবুও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে দেশবাসীর মধ্যে নারী শিক্ষার আবশ্যকতা নিয়ে একটি গণচেতনা তৈরি হয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে দেশজুড়ে আর্থিক সংকট, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও নারী শিক্ষার জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। এই সময়কালে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত, নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের প্রচেষ্টা শিক্ষা প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ করে। চাকুরি গ্রহণের এই প্রবণতা সমাজে নারীদের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করেছিল, তেমনি তা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর চিরাচরিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে নারী শিক্ষার এই যে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন ভারতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলা সহজতর হয়। মূলত ১৯২১ থেকে ১৯৪৭—এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও উত্তরণের পথ ধরেই আধুনিক ভারতীয় নারীর শিক্ষার জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল। সামাজিক সচেতনতা ও উদারতা সামাজিক চিন্তার আরো পরিবর্তন আনতে শুরু করে। মেয়েদের বিবাহযোগ্যতার বয়স আরও বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং শিক্ষা সমাপন করার প্রবণতার বৃদ্ধি দেখা যেতে লাগল। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ৫৯টি কলা এবং বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, ২,৩৭০টি মাধ্যমিক এবং ২১,৪৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মেয়েদের জন্য। ৪,২৮৮টি শিক্ষাকেন্দ্র মেয়েদের বৃত্তিমূলক, প্রশিক্ষণমূলক এবং বিশেষ শিক্ষাও প্রদান করত। রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দানের ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলির ওপর বোঝা কিছুটা কমেছিল। সেই সময়ে সরকারের পরিচালনাধীন নারী প্রতিষ্ঠান ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মধ্যে।

এই সময় কোএড শিক্ষা অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়।এভাবেই প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ ও দীর্ঘকালীন সরকারি উদাসীনতা উপেক্ষা করে মহান ব্যক্তিত্বদের ত্যাগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নারী শিক্ষা এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আধুনিক বাঙালি সমাজ গঠনের পথও প্রশস্ত করেছিল।

উপসংহার: পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার উন্মেষ কেবল একটি বৌদ্ধিক বিবর্তন ছিল না, বরং তা ছিল শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও সামাজিক জড়তার বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রাম। ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের ধারায় নারী জাগরণ ছিল এক যুগান্তকারী ও আধুনিক অধ্যায়। বৈদিক যুগের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘকাল ধরে সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকা মধ্যযুগীয় অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে নারী সমাজ মূলত নবচেতনার আলোকস্পর্শে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পায় ঊনবিংশ শতকে। সেই সময়ে নবজাগরণ যে মশাল প্রজ্বলিত করেছিল, তার ফলেই সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে এবং শিক্ষা ও অধিকার সম্পর্কে পূর্বতন রক্ষণশীল বাধাগুলো ক্রমশ অপসারিত হতে শুরু করে। দীর্ঘদিনের সামাজিক জড়তা কাটিয়ে নারীরা আত্মমর্যাদার এক নতুন পাঠ গ্রহণ করতে শেখে। এই নবজাগরণের মশাল বহন করেছেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সাবিত্রীবাই ফুলে ও বেগম রোকেয়ার মতো কিংবদন্তিরা। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারী সমাজ নবচেতনার আলোকস্পর্শে এক নতুন বিশ্বের সন্ধান পায়। এই আন্দোলন কেবল অন্দরমহলের অন্ধকার দূর করেনি, বরং নারীর মেধা ও যোগ্যতাকে বহির্জগতের বৃহত্তর আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বা চন্দ্রমুখী বসুর স্নাতক ডিগ্রি লাভ—প্রতিটি ঘটনাই ছিল এই মহৎ বিবর্তনের জীবন্ত প্রমাণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ এবং মিশনারিদের উদ্যোগ এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুঘটক হিসেবে কাজ করলেও, ভারতীয় মনীষীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আধুনিকতার মেলবন্ধনই নারীশিক্ষাকে একটি গণআন্দোলনের রূপ দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী ডাক এবং স্বামী বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরতার আদর্শ নারীকে কেবল গৃহকোণ থেকে বের করে আনেনি, বরং দেশমাতৃকার সেবায় ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে যোগ্য অংশীদার করে তুলেছে। ধন্ডো কেশব কার্ভের নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, শিক্ষার আলো কোনো বিশেষ ধর্ম বা গোষ্ঠীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। মূলত প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের এই দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ চলাই আধুনিক ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়েছিল। সেদিন প্রতিকূলতা ও রক্ষণশীলতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল, আজ তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সমাজকে ছায়া দিচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এটি আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নারী সমাজ কেবল ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে নারীরা আজ পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করছে। এই সামগ্রিক অগ্রগতি কেবল

ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং তা একটি জাতির সার্বিক বিকাশের অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং, নারীশিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞানের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; এটি ছিল নারীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের এক মহাকাব্যিক অভিযাত্রা। সেই লড়াইয়ের উত্তরসূরি হিসেবে আজকের নারীরা বিশ্বমঞ্চে যে সাফল্যের ছাপ রাখছেন, তার মূলে রয়েছে সেই কালজয়ী সংগ্রাম ও দূরদর্শী সংস্কারকদের অদম্য সংকল্প। আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তনের সারথি হয়ে নারীরা যেভাবে নিজেদের মেধা ও মনন দিয়ে প্রতিটি চড়াই-উতরাই অতিক্রম করছে, তাতে আগামীর দিনগুলোতে তাদের ভবিষ্যৎ যে আরও উজ্জ্বল এবং গৌরবময় হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। নারীশক্তির এই জয়যাত্রা আধুনিক ভারতের এক অনন্য সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতবিতান' -এর সেই কালজয়ী পঙক্তিমালা আজ নারী সমাজের মুক্তির জয়গান গেয়ে ওঠে—

> "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
> দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে
> আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে;
> আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়, ঘাসে ঘাসে।"[৫]

তথ্যসূত্র:

১) শর্মা নন্দিনী, এডুকেশন, রেণু কুরুক্ষেত্র, পৃ. ৭৮
২) মুখোপাধ্যায় দুলাল, হালদার তারিণী, চন্দ বিনায়ক, সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা, পৃ.২৪৪
৩) পাল দেবাশিস, শিক্ষাবিজ্ঞান, পৃ.৩৯৬
৪) তদেব, পৃ.৩৯৭
৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পৃষ্ঠা ১৪১